International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
Volume-III, Issue-VIII, September 2017, Page No. 1-10
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

সমরেশ বসুর গল্প : নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি

প্রীতিলতা সরকার
সহকারী অধ্যাপিকা, কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়, সোনামুড়া, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

Samaresh basu was born a prominent Bengali writer who lived in 20th century. He was born on 11th december 1924. In the twentieth century, the demand of the people of the society, in the modern era of Bengali literature, to preserve the identity of the people of the society, we have to look at Samaresh basu. Humanitarianism has earned him the distinct place for the lower classes.

All the lower classes take the place of thoughts of Samaresh. It will be discussed indetail later on how, Samaresh Bose has elaborated on issues related to low life, lifehood, culture, harmony, politics , orthodoxy etc.

১.

কোনো সমাজের পরিকাঠামো সাধারণত রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির সূত্রে বাঁধা। এই বিষয়গুলি মানুষের সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু ব্যক্তি সমাজের অংশবিশেষ তাই ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় গড়ে ওঠে ভাষা, সমবায় চিন্তা ও ধর্মান্তকরণের মধ্যে। আবার সমাজে ব্যক্তির আচরণবিধি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার উপরও নির্ভরশীল। ব্যক্তির পরিচয়ের অংশবিশেষ এবং সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক এক জটিল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত। আর সংস্কৃতি আলোচনা করতে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির অর্থনীতির বিশ্লেষণ করা অধিকতর জরুরি। কারণ গ্রিস ও রোমের মতো ভারতবর্ষেও বিকশিত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সামাজিক কাঠামো হিসেবে শ্রমবিভাজন ও বর্ণব্যবস্থাকে সাজানো হয়। শ্রমবিভাজন ও বর্ণব্যবস্থার বিশ্লেষণ নিম্নবর্গীয় ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

নিম্নবর্ণের উদ্বৃত্ত শ্রমকে আত্মসাৎ উপযোগী ব্যবস্থার উপযুক্ত শোষণকারী হল উচ্চশ্রেণি। আর শ্রমজীবী জনগণই হল শূদ্র বা ম্লেচ্ছ বা নিম্নবর্গ। প্রাচীন ভারতের সমাজ গঠন ও বিন্যাস বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে দেবদেবতার আরাধনা, বিজয়গাঁথা, বেশবাস, অলংকার ও আকৃতি বর্ণনা ছাড়া আলোচনা অসম্পূর্ণ। ঋগ্বেদসংহিতা থেকে শুরু করে বাংলা ভাষার আদি ও মধ্যযুগ অবধি দেবতার সন্তুষ্টির বিধান উল্লিখিত। ক্ষমতা, শক্তি, শৌর্য, বীর্যের প্রসঙ্গই প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কিন্তু আধুনিক চিন্তাভাবনায় আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ সংস্কৃতিচর্চায় পর্যবসিত হয়। 'ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন' এই বইয়ে এর উল্লেখ রয়েছে। ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশের মূলে রয়েছে কৃষি। কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির ধারক অস্ট্রিক জাতি। কারণ অস্ট্রিক জাতির অবস্থান যদি দেখি তাহলে আসাম অঞ্চল দিয়ে তারা ভারতে আসে। সেইসব অঞ্চলে এরা কৃষিকাজ করত। আর্যেরা যখন ভারতে এল তখন সুসভ্য দুটি অনার্য জাতির উপস্থিতি ছিল যথা—দ্রাবিড়, অস্ট্রিক। দেখা যায় দ্রাবিড়, অস্ট্রিক এবং আর্য জাতি নিজেদের

সংস্কৃতির আদান-প্রদানে অসাধারণভাবে মিশে যায়। এই সংমিশ্রণ ও পরিবর্তনের পথেই ভারতের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সংস্কৃতি কি এই প্রসঙ্গে গোপাল হালদার লিখছেন, ''আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত কৃতি বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি—মানুষের জীবন সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।''

প্রাচীন ভারতে অস্ট্রিক জাতি সরল, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় জাতিরূপে পরিচিত। তারা চরিত্রগত দিক থেকে অলস, উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন, সংগতিহীন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনার্য অস্ট্রিকদের স্থান নিম্নে। বর্তমানে অনার্যদের বংশধর হিসেবে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, শবর, ভীল প্রভৃতিদের বোঝায়। সমাজে অনার্যবংশীয়রা নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি মূলত গ্রাম্যজীবনকে অবলম্বন করে পুষ্টি লাভ করেছে। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির অনেক সময়ই পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক সম্পর্কের সাথে বিভিন্ন মানুষের অর্থনৈতিক স্তরেরও পরিবর্তন ঘটে। নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনা করতে করতে জীবনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে সমাজনীতি ও অর্থনীতি। সমাজনীতি ও অর্থনীতিই রাজনীতির পটভূমি তৈরি করে। আর অর্থনীতি ও সমাজনীতি মানেই লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবনব্যবস্থা। লোকসংস্কৃতির শিকড় ছড়িয়ে আছে নিম্নবর্গের জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে। এছাড়া সমাজের উচ্চবর্গের জীবন ও সংস্কৃতিপূর্ণ মননশীলতার প্রভাব নির্ণয়ে নিম্নবর্গের সংস্কৃতিকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের মন্তব্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য— ''সংস্কৃতির মূলমন্ত্র হোক-জীবননিষ্ঠা, অর্থাৎ বাস্তববোধ ও বাস্তব জীবন দর্শন।''

২.

'নিম্নবর্গ' বা 'Subaltern' শব্দটি মার্কসের প্রোলেতারিয়েত শব্দের অবিকল শব্দ নয়। প্রোলেতারিয়েত শব্দটি পুঁজিতন্ত্রের একটি শ্রেণি। নিম্নবর্গকে চিনতে হয় মানুষের স্ফুট অস্ফুট অধীনতার চেতনাকে উন্মোচন করে। কারণ নিম্নবর্গ তার স্বরকে মজুত রাখে লোক ইতিহাসের মধ্যে। নিম্নবর্গ শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্রেই বিপরীতে উচ্চবর্গ-এর অনিবার্যতাকে প্রকাশ করা। নিম্নবর্গ-এর নিম্ন শব্দটি কোনো শ্রেণির অধীনতা, দীনতা, অসহায়তাকে প্রকাশ করে। এজন্যই নিম্নবর্গ-এর সংস্কৃতি জীবনসম্পৃক্ত, বস্তুসংলগ্ন ও মানসসম্ভূত। সাধারণত নিম্নবর্গের সংস্কৃতিচর্চা বা মননচর্চায় নিজস্বতার ছায়া দৃশ্যমান। তাদের সংস্কৃতিচর্চায় ভিত ও উপরিকাঠামোর সূত্র ধরে সন্ধানী হওয়ার পথ খুব সহজেই ধরা যায়। সংস্কৃতির প্রধান বক্তব্যই যদি জীবনসংগ্রামে ব্রতী বা প্রকৃতিতে অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টায় উন্নতি হওয়া বোঝায় তাহলে বিশ শতকের অনেক গল্পকার গভীরভাবে জীবনসংগ্রামের গল্প রচনায় মগ্ন ছিলেন। তাদের মধ্যে সমরেশ বসু হলেন বাস্তববাদী গল্পকার। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ স্বাধীনতাপূর্ব আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে সমাজের নিচুতলার মানুষের পরিচয় সন্ধান করলে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার দিকে। সমরেশ বসুর ছোটোগল্পে নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি মানবিকতাবোধই তাঁকে স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী করেছে। এ বিষয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য—''এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আমাদের অগ্রজেরা সমাজবাস্তবতার যেসব তত্ত্ব মনন দিয়ে মনীষা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, তা ধীরে ধীরে এবং মহাকালের রথের টানে অনিবার্যভাবে হয়ে উঠেছিল আমাদের হৃদয়ের সামগ্রী। সমরেশ আমাদের উপলব্ধির সেই বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের যুগের প্রথম লেখক নন, কিন্তু একমাত্র লেখক যিনি আমাদের সাহিত্যে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন। সে দিগন্তটি রাজনীতির লাল মশালে জ্বালা দিগন্ত নয়, জীবন-সত্যই তাঁর লক্ষ্য।''

সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কাব্য, কবিতা, গান, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে। কিন্তু জীবনসম্পৃক্ত যাবতীয় উপকরণ, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, প্রাত্যহিক কার্যকলাপ, চেতন অবচেতন মনের সামগ্রিক উপাদানকে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মফস্বল শহরের নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব নিরূপনে সমরেশের অভিজ্ঞতা ছিল অগাধ। এই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাঁর জীবনযাপন ও পরিপার্শ্ব থেকে। তাই নিম্নবর্গীয়রা তাদের সমস্ত কিছু নিয়ে

সমরেশ বসুর ভাবনায় জায়গা করে নেয়। তাঁর গল্পের জগৎ নিম্নবর্গীয়দের জীবনযাত্রায় সমৃদ্ধ। তাঁর জীবনের মধ্যেই নিহিত ছিল গল্প রচনার রসদ। তাঁর বিভিন্ন গল্পে চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে চারপাশের মানুষও উঠে এসেছে। এককথায় বলা যায়, নিম্নবর্গীয় জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, সংস্কার, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়কে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারায় সমরেশ বসুর কৃতিত্ব।

৩.

নিম্নবর্গীয় নটদম্পতির জীবনযন্ত্রণা, সমস্যাদীর্ণ লড়াই 'পাড়ি' গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। নিম্নবর্গীয় নটদম্পতি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার দ্বারা শোষিত। তারা বিভিন্ন পেশায় শ্রমের বিনিময়ে পয়সা রোজগারে অক্লান্ত পরিশ্রমী। প্রচণ্ড অর্থসংকটে জর্জরিত হয়ে স্বল্প পয়সায় শুয়োর পার করার কাজও তারা হাতে তুলে নেয়। জীবনের মূল কথা বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকার জন্য তাদের প্রতিনিয়ত চলে লড়াই। লড়াই মানে চেষ্টা। মানুষের দুরবস্থার পরিবর্তনকারী চেষ্টা ও আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণভুক্ত আধুনিকোত্তর চিন্তাভাবনায় আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ সংস্কৃতিচর্চায় পর্যবসিত। তাই গল্পকার সমরেশ বসু 'পাড়ি' গল্পের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিকোত্তর ভাবনায়। নটদম্পতির আর্থ-সামাজিক অবস্থানটি স্পষ্ট হয় সোনার মাকড়ির বক্তব্যে—''সোনার মাকড়ি বলল, উই যে ওপারে উত্তরে দেখা যায় শিউমন্দির, তুলতে হবে ওখানে। উনত্রিশ জানোয়ারের জন্য উনত্রিশ আনা মজুরি।''

৪.

বাককেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে সমাজ, সময় ইতিহাসে ছড়ানো, ছিটানো, এলোমেলো, সংলগ্নহীনতা জায়গা পায়। বিশেষ করে নিম্নবর্গীয় চরিত্র নিয়ে যখন গল্পের কাহিনি বিশ্লেষিত হয় তখন সমাজের লোকায়ত বিশ্বাস, চিহ্ন, লক্ষণ গানের ভাষায় রূপ পায়। নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিতে উচ্চবর্গের মতো শাস্ত্রনির্ভরতা ও আচার সর্বস্বতার সূত্র বজায় থাকে না। লোকায়ত বিশ্বাসের চিহ্ন থাকে নিম্নবর্গের সংস্কৃতি চর্চায়। বাককেন্দ্রিক সংস্কৃতি চর্চায় আসে গান বা গীতির প্রসঙ্গ। গান হল সংস্কৃতি চর্চার তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় বহনকারী মাধ্যম। সমরেশ বসুর 'গুনিন' গল্পে বাগদী জাতির ছেলে নকুড়, তাঁর জাতির সংস্কৃতির পরিচয় নিয়ে হাজির হয়েছে। নকুড় তন্ত্র, মন্ত্র, বশীকরণের গুণ গানের ভাষায় প্রকাশ করে এইভাবে—

''শিব ঠাকুরের পাথর ঘষে
গৌরী ছোটে কৈলাসে।
বাঁশী বাজায় কেষ্ট বসে,
আয়ানের বউ ছুটে আসে।
আমি ভূতের মাথার ঘিলু নিয়ে,
ছিটা দিলাম অমুকের গায়ে।''

সমাজে নিম্নবর্গীয় তান্ত্রিকরা বাককেন্দ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। তাদের সংস্কৃতি বিশ্লেষণে বাককেন্দ্রিক সংস্কৃতির মাধ্যমকে অস্বীকার করা যায় না।

সাহিত্যের সৃজনশীলতা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তুর সাযুজ্য রেখেই সমরেশ বসু গল্পের নিম্নবর্গীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন। 'এসমালগার' গল্পটি নিম্নবর্গীয় মানুষদেরই কাহিনি। গল্পের গোরা খুবই দরিদ্র পরিবারের সদস্য। সে আইনকে অস্বীকার করে, জীবন বাঁচানোর তাগিদে চুরির কাজে লিপ্ত হয়। গোরার জীবিকা লড়াইয়ের মৃত্যুস্পর্শী অভিজ্ঞতা ও জীবনযন্ত্রনা গানের ভাষায় প্রকাশ পায় এইভাবে—

''চাল চুলো নেই বেচালেরে
আমি যোগাই চাল।''

গোরার প্রতিবাদও ছন্দে আবদ্ধ—

"যে বলে আমাকে শালা
তার বোনেরে দিব মালা।"

সমরেশের নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি চর্চার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'অকালবৃষ্টি'। আলোচ্য গল্পে নিম্নবর্গ বলতে নারীজাতিকে বোঝানো হয়েছে। নারীর জন্মের যন্ত্রণার সঙ্গে দারিদ্র্য জুড়ে গিয়ে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। দুর্বিষহতাই 'অকালবৃষ্টি' গল্পের গানে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠে—

(ক) *"মাগো, জম মো দিলি এ সমসারে মেয়ে করে,*
ত্যাখন তো বললি না গো, আবাগী আমি অবলা,
আজ য্যাতই কেন কাঁদিস না মা, (তবু) প্রাণ যারে চায়,
তার গলাতে পরাব আমি মালা।"

(খ) *"মুখের ছায়া জলের তলে, মনের ছায়া দেখি না হয়,*
আমার মনের ছায়া তোমার চকেতে,
হায়, পোড়া মন এত ঢাকি এত চাপি সব্বো অঙ্গ উদাম করে,
তবু ঘোমটা ঢাকা পড়ে না মোর মনেতে।"

সুলোচনার গান ব্যঞ্জনাময়, গানের শব্দ গভীর ভাবনাপূর্ণ, গাঢ়। তাঁর নারী জীবনের সত্য কথা উঠে এসেছে পংক্তিদ্বয়ে। ভূতেশ আর সিধুর মাঝখানে সুলোচনার উপস্থিতি ও তাঁর মনের ভাবের প্রকাশ ঘটেছে গানের ভাষায়— "প্রাণ যারে চায়, তার গলাতে পরাব আমি মালা।" এই লাইনে সুলোচনার মনের ভাবনার অভিব্যক্তির সূত্র ধরা পড়ল জীবনের অন্তিম লগ্নে। মনের গতিবিধি, রূপের কোনো রকম ছায়ার উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও এর প্রকাশ বিচিত্র। চোখ যেন সুলোচনার মনের কথা প্রকাশ করে। ভূতেশের চোখে মনের ছায়া সুলোচনা দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু অবশেষে মৃত্যুর ছায়া তার জীবনে চলে আসে। সুলোচনার মনের ভাবনা, অনুভূতি চেপে রাখতে চাইলেও চেপে রাখতে পারেনি। তাই গানের ভাষায় ব্যক্ত হয়— "তবু ঘোমটা ঢাকা পড়ে না মোর মনেতে।"

'নিমাইয়ের দেশত্যাগ' গল্পের বিষয় হল নিম্নবর্গের সংস্কৃতি। নিমাইয়ের দেশত্যাগের যন্ত্রণা, জীবনসংগ্রাম তার সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে গেছে। নিমাই ছাড়া নিম্নবর্গীয় জনসমাজের পরিচয় গল্পের প্রথমেই পাওয়া যায়— "এ যেন সেই বন্যার জলে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো। কোথায় ঠেকে, কোথায় পড়ে হেজে পচে যায় তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই।" গল্পে সর্বহারা, উদ্বাস্তু ও সহায় সম্বলহীন মানুষের সন্ধানও মেলে। দেশভাগ, দাঙ্গা, লুটপাট ইত্যাদি কুৎসিৎ রূপ সমাজের নিম্নবর্গের জীবনকেও পাল্টে দেয়। রাতারাতি মানুষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। পূর্ববঙ্গের নিমাইও তেমনি দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। নিমাইর মা ছিল না। মাতৃহারা নিমাইর পরিচিত মানুষ শরাফত শেখ, বুড়ো কর্তা, মনু, রোশনারা ও আন্না সবাইকে ছেড়ে আসার যন্ত্রণা সমরেশ বসুর 'নিমাইয়ের দেশত্যাগ' গল্পে বড় অনায়াস ভঙ্গিতে উঠে আসে। সমরেশ বসুর নিম্নবর্গ চেতনার আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে কালচেতনার উল্লেখ বেশি করে রয়েছে কিন্তু সে কালচেতনা দেশচেতনারই অভিমুখী। এই দেশচেতনাই নিমাইয়ের গানে ভাষা পেয়েছে—

"মাগো কহিতে পরাণ যায়
মুখে নাহি বাহিরায়,
সোনার নদে আঁধার করে
নিমাইচান্দ চলে যায়।"

গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' গ্রন্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া হয়েছে— ''মানুষের জীবন সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি; আর সংস্কৃতির মূল ভিত্তিও অত্যন্ত বাস্তব—জীবিকা প্রয়াস সহজায়ত করা। কথাটাও তাই পরিষ্কার-জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিরও পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জন হয়, তাহার পরিবর্তন চলে।'' নিম্নবর্গের কর্মসংস্কৃতির অনুষঙ্গের প্রমাণ 'জোয়ার ভাঁটা' গল্পে মেলে। জীবিকার সাথে জড়িত মানুষের জীবনীশক্তি। এই জীবনীশক্তি দিয়েই মানুষের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই জীবনীশক্তির বলেই 'জোয়ার ভাঁটা' গল্পে সমরেশ বসুর বর্ণনায় লাল শাড়ি পরা দুটি কামিন একসঙ্গে গেয়ে উঠল:

''ওই আসে গো ওই আসে লায়ে ভরা টালি
ঘরে আমার ছা গুমোয়
মিনসে পড়ে শুড়ি খানায়
বেলা না যেতে আমি লাভ করব খালি।''

শ্রমিক, মজুর, ছন্নছাড়া মানুষ সবাই আয়ের পথে দৌড়ায়। প্রত্যেকদিন দিনমজুররা কাজ পায় না। কাজ বা জীবিকা হলো তাদের প্রাণ। অস্থায়ী জীবিকার কারণে তাদের জীবনও অস্থায়ী ছন্নছাড়া। শ্রমিকদের জীবনে চারিদিকে অন্ধকার আবার আলো। কাজ না থাকলে অন্ধকার আর কাজ থাকলে আলো। জীবন যন্ত্রণা ও হতাশা তাদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। শ্রমিকরা কাজ করে আনন্দ পায়। কাজই শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের স্তর বিন্যাস করে। শ্রমিক জীবনের এই চরম বাস্তবতা ও নিম্নবর্গীয় কর্মসংস্কৃতির পরিচয় কৈলাশের গান জুড়ে রয়েছে—

''বাবুসাহেব গো, পেট ভরেনি,
কাজ করিয়ে পয়সা দেও, ক্ষুধা মরেনি।
দেখ আমার শুকনো বুক, ছাঁয়ের তেষ মেটেনি,
বয়সকালে শরীলে মোর রং লাগেনি।''

তেভাগা আন্দোলন নিম্নবর্গীয় রাজনীতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, এর ছাপ শিল্প সংস্কৃতিতে পড়ে। সমরেশ বসুর 'প্রতিরোধ' গল্পের পটভূমি হলো বিখ্যাত তেভাগা আন্দোলন। আকাল ও অভাবের দিনে বন্দুকের গুলিতে নিহত কৃষকের সংগ্রাম ও তেভাগা আন্দোলনে প্রাণিত মানুষের নতুন জন্মের কথা বলে 'প্রতিরোধ' গল্পটি। বাংলার কৃষকের চিরকালীন শোষণ ও দুর্বিষহ অনশন যন্ত্রণা নিয়েই এই গল্পের সুবলের গান—

''এমন মহা মন্বন্তর জন্মে দেখি নাই।
মায়ের বুকের সন্তান মরে, এক ফোঁটা দুধ নাই।
ছিটাল কাটালের ভাত লইয়া মায়েপুতে ঝগড়া।
সন্তানেরে ফাঁকি দিয়া, করে পচা অন্নের বখরা।''

তৎকালীন কৃষকের দুরবস্থা বিবেচনার জন্য ইংরেজ সরকার ভূমি রাজস্ব কমিশন বসিয়েছিল। গরীব চাষি ও ভাগচাষির লড়াইয়ের ইতিহাস নিয়ে 'প্রতিরোধ' যেন বস্তুনিষ্ঠ তথ্যসমৃদ্ধ প্রমাণযুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। তাছাড়া গল্পটি আমাদের দেশের বাককেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গের পরিচয়বাহী। তাই সুবল এই গল্পে ব্যক্তিকতার সঙ্গে রাজনীতি, জনসংগ্রাম ও জনগণের অন্তর্বেদনা নিয়ে গান গায়—

''শুন গো দেশবাসী, শুন মন দিয়া,
কহিতে পরাণ কান্দে, কান্দে আকুল হিয়া।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইল, মইল উলুখড়,
আশি টাকা মন চাউল হইল, বাড়ল ধানের দর

শুকনা ঘরে দৈত্যের মতো হাঁ কইরা রইছে,
পানি দেওয়ার লোক নাই সব মরণ শয্যা লইছে।''

সমকালের সংকট গানের ভাষায় উঠে এসেছে—

''এখন মহা মন্বন্তর জন্মে দেখি নাই।
মায়ের বুকের সন্তান মরে, এক ফোঁটা দুধ নাই।
ছিটাল কাটালের ভাত লইয়া মায়েপুতে ঝগড়া।
সন্তানেরে ফাঁকি দিয়া, করে পচা অন্নের বখরা।''

সাহিত্যের প্রচলিত প্রথা ও বহমান স্রোতকে পাশ কাটিয়ে সমরেশ বসু নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। দাঙ্গার পটভূমি নিয়ে তাঁর সাড়া জাগানো গল্প হলো 'আদাব'। এই গল্পে থেকেই সমরেশের প্রতিবাদ শুরু। আমাদের দেশের খাদ্যাভাবের সঙ্গে কৃত্রিম বস্ত্রসংকট দেখা দিয়েছিল। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বস্ত্র সংকটের নগ্নরূপ সুবল সখার গানের বুলিতে শুনতে পাই—

''নোটের গোছা বান্ধে গেঁজে হাইসা চোরা ব্যাপারী,
ও হরি মাথা খাও, পিছা মারো এমন আড়তদারির।
প্যাটের জ্বালায় পোলা মরে, বস্ত্র জ্বালায় মা দেয় গলায় দড়ি,
হা{য়রে পেট কাঁপাইয়া, দাঁত দেখাইয়া, হাসে ড্যাকরা চোরাকারবারি।''

সমরেশের প্রতিবাদের ভাষা জীবনাভিজ্ঞতা নির্ভর; কল্পজগতের নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তেভাগা আন্দোলনের জন্যই তাঁর গল্পের দাবি, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিবাদের ভাষা রূপ খুবই উদ্দীপনাময়—

''আমার খুনের দানা কইটা লমু মানি না হুকুমদারি,
কলিজার খুনের পরদায় প্রাণ বাচামু সত্য-যুগের হকদারি।''

৫.

মানুষের দৈহিক কৌশল ও পরিশ্রম যে সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাকেই অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি বলা হয়। নাচ ও গান ছাড়া অন্যান্য নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক আচার-আচরণ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় নিম্নবর্গের জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বনও হয়ে উঠে অঙ্গভঙ্গির কলা কৌশলগুলি। সমরেশ বসু অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নিম্নবর্গীয় মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করে 'নররাক্ষস' গল্পটি রচনা করেন। 'নররাক্ষস' গল্পের তারক ও মিনতির জীবিকার একমাত্র পথ ছিল নররাক্ষসের অভিনয় করা। গল্পে গ্রাম বাংলার মেলা, মেলায় তাঁবু লাগিয়ে নররাক্ষসের অভিনয়ের উপস্থাপনা সমরেশ বসু বিশ্বস্তভাবে করেছেন। গ্রাম বাংলায় অনেকেই বিভিন্ন অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। 'নররাক্ষস' গল্পের বর্ণনায় অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির জীবন্ত রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে—''হঠাৎ নররাক্ষস চিৎকার করে জনতার দিকে ছুটে আসতে চাইল। আর হাত পা বাঁধা। সে আসতে পারছে না, তাই আরো জোরে জোরে চিৎকার করছে। সেই সময়ে একটা গলার স্বর শোনা গেল, কীরে রাক্ষস, তোর খিদে পেয়েছে।''

'নররাক্ষস' গল্পের দ্বিতীয় দৃশ্যে অন্য একটি অভিনয় শুরু হয়—''নররাক্ষস চিৎকার করে সম্মতি জানাতেই একটি জ্যান্ত মুরগী এসে তার হাতের সামনে পড়ল। মুরগীটা চিৎকার করে উঠল, কিন্তু মুহূর্তে তাকে ছিঁড়ে চামড়া ছাড়িয়ে লাল দগদগে মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল রাক্ষস আর সেই সঙ্গেই গর্জন।''

৬.

অতীতকাল থেকে পটশিল্পের উল্লেখ সাহিত্যে পাওয়া যায়। নিম্নবর্গীয়রা এই শিল্পের সাথে জড়িত। সময়ের বিবর্তনের ধারায়, বিভিন্ন জনজাতির আচার-আচরণ, ধর্মীয় উপাখ্যান ও সংস্কৃতির ধারক হিসাবে পটুয়ারা পটশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস করে। অঙ্কনলিখনকেন্দ্রিক সংস্কৃতি বলতে পটুয়াদের দ্বারা সাজানো দেওয়াল চিত্র, পটচিত্র, ছবি আঁকা প্রভৃতিকে নির্দেশ করে। সমরেশ বসুর কিছু গল্পে পটশিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর 'শেষ মেলা' গল্পের মোহন চিত্রকরের জীবিকা গ্রহণ করে। সে বিভিন্ন মেলাতে মাটির হাঁড়ি, সরার ওপর ছবি এঁকে জিনিসপত্র বিক্রি করে। ছবি আঁকার বিষয়টি সংস্কৃতির সঙ্গে সবসময়ই সংযুক্ত। কিন্তু আর্থ-সামাজিক মর্যাদা পাবার জন্য মোহন নিজের জীবিকাকে এক জায়গায় ধরে রাখতে পারেনি। তাই হাঁড়ি সরা বিক্রি করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে সংস্কৃতিকে প্রতিকুলতা থেকে রক্ষা করে,—"গোলা খড়ি মাটির পোঁচ দেওয়া মাটির হাঁড়ি আর বাসনগুলোকে একাগ্রচিত্তে রঙিন তুলির চিত্রাঙ্কন করে চলেছিল মোহন, জৌলুস বাড়াবার খাতিরে সামনে মাদুর পেতে ছড়িয়ে রেখেছিল—কিছু রঙিন কাচের চুড়ি।"

পটশিল্প প্রধানত দু-ধরনের। প্রথমত, লম্বা কাপড়ে আঁকা ছবি রোল করে রাখা হয় আর দ্বিতীয়ত, চোখ শিল্প বা আই আর্ট। পটশিল্পের ভিত্তি 'চোখ শিল্প' বা আই আর্টকে বোঝায়। কারণ এখান থেকেই পটশিল্পের সূচনা। 'শেষ মেলা' গল্পের চিত্রকর মোহন সারা বছর পটের পসরা বানায়। পটের পসরা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। পলাসপুর, কোপগড়, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে মোহন পসরা বিক্রি করে। 'শেষ মেলা'-র মোহন পটুয়ায়, হাঁড়ি, সরায় ছবি এঁকে বিক্রি করার মধ্যেই নিম্নবর্গের সংস্কৃতি মনস্কতার সন্ধান মেলে।

বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসাবে পটশিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে গরীব পটশিল্পীরা রোজগারের তাগিদে শহরমুখী হয়ে, কলকাতার আশেপাশে এরা বসবাস শুরু করে। পটশিল্পের ধারাকে তারাই নতুনভাবে উপস্থাপিত করে। কাপড় ছেড়ে এরা আর্টপেপার ও জলরঙ ব্যবহার করে দেবদেবীর ছবি আঁকা শুরু করে। ধীরে ধীরে দেবদেবীর ছবির পরিবর্তে সময়োপযোগী বিষয় তাদের তুলির টানে ছবি হয়ে উঠে। নিম্নবর্গীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার বৈচিত্র্যময়তা পটশিল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। 'শেষ মেলা' গল্পে নিম্নবর্গীয় মোহনের হাতে কামারের কামারশালা, চাষির জমি নিড়ানো, ঢেঁকিশালা ইত্যাদি ছবি রঙ তুলির টানে রঙিন হয়ে উঠে, গল্পের বর্ণনা এরকম—"কত যে অসংখ্যা পট-মাটির বাসনের গায়ে। বাদ যায়নি অনাদি কামারের কামারশালা, ঘরের পিঠ, বাবুদের জমিতে মানু সেখ আর অবিলাসের নিরেন দেওয়া মাটি কাটার ছবি। খাঁদু পিসির ঢেঁকি ঘরের পটও উঠছে পাঁচশো হাড়িটার সরায়। কিন্তু কি সর্বনাশ! খাঁদু পিসির ছেলের বউয়ের ঘোমটা খসা মূর্ত্তিখানিও যে উঁকি মারছে সরার পটে।"

৭.

বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি অনেক পুরানো। মৌর্য আমলের আগে খুব বেশি বস্তুকেন্দ্রিক শিল্পকর্মের সন্ধান পাওয়া না গেলেও কুষাণ আমলে মাটির ও ব্রোঞ্জের তৈরি অনেক বস্তুর সন্ধান মেলে যেমন— আয়না, বাতি, পোড়া মাটির নকশা ও মূর্তি ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায় পোড়া মাটির নকশা ও মূর্তি ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায় পোড়া মাটির নকশা ও মূর্তি। এই সংস্কৃতিই আধুনিক যুগের মানুষের শিল্পকর্ম, উৎপাদিত বস্তু, আসবাবপত্রাদি নির্মাণের সঙ্গে মিশে গেছে।

সমরেশ বসুর 'পসারিনী' গল্পটি বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে লেখা। এই গল্পে পুষ্পলতা কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরি করে, ট্রেনের কামড়ায় হকারি করে। কাপড় দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের নকশা বানানোর কাজ পুষ্পলতার মতো বহু নিম্নবর্গীয় পরিবারের আয়ের উৎস। আধুনিক যুগে বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি

ঘটছে। 'পসারিনী' গল্পে সমরেশ সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধির সূত্রকে ধরেছেন এইভাবে— ''পুষ্পর হাতে তখন ছোট ছোট কয়েকটা ন্যাকড়ার পুতুল জুলজুল করে নুলো দোলাচ্ছে। আর একটা চাপা সরু মেয়েলী গলা; আমার নিজের হাতের তৈরি, ন্যকড়া আর তুষের তৈরি, তার উপর রং করা। দাম দু-আনা করে...,''

৮.

গ্রামীণ জীবনে মেলা নিম্নবর্গের বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র। গ্রামীণ মেলার সাজসজ্জা, সরঞ্জামই লোকসংস্কৃতির পরিচয়কে বহন করে চলেছে প্রাচীনকাল থেকে। মেলার বর্ণনা সমরেশ বসুর একাধিক গল্পে রয়েছে। মেলা শুধু সংস্কৃতির পরিচয় নিয়ে আসে না, মেলার উপলক্ষ কাল, আয়োজনের নানান তথ্যের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় জনজীবনের সাক্ষ্য বহন করে। 'নররাক্ষস' গল্পের মেলার বর্ণনায় অঞ্চলভিত্তিক লোকসংস্কৃতির উৎকর্ষের পরিচয় রয়েছে— ''গতকাল থেকে স্টেশনের ওপারে রাধাকান্ত জীউর মাঠে, মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমানন্দ ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব শুরু হয়েছে। মাঘী পূর্ণিমা সেই তিথি। তার এখনো কয়েকদিন দেরী আছে। ভক্তরা উৎসব শুরু করে দেয় আগেই। সেই উপলক্ষে প্রতি বছরই মেলা। দিনে দিনে মেলা বড়ই হচ্ছে। খাবার আর মনোহারী দোকানের সঙ্গে আস্তে আস্তে নানান্ জাদু আর সার্কাসের দল আজকাল ভিড় করে।''

যাত্রা, জলসা ও নানা বিনোদনকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিম্নবর্গীয়রা যুক্ত। যাত্রা, জলসা শ্রমজীবী মানুষের বিনোদনের জায়গাও বলা যায়। যাত্রাপালা ও জলসা করে নিম্নবর্গীয়রা নিজেদের বক্তব্যকে সবার সামনে কীভাবে তুলে ধরে সমরেশ বসু রচিত 'জলসা' গল্পটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেখা যায় জলসা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের আনন্দের ঘোরে রেখে তাদের ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মের নামে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার জন্য জলসার গায়করা 'রঘুপতি রাজারাম' গান গায়। কিন্তু শ্রমিকদের সমাজ-শাসনের বিপক্ষে গায়করা গান গেয়ে খেপে আবার প্রতিবাদ করে—''গায়কেরা যেন খেপে আছে। বাবু রঘুনাথ রাও ঢোলক পিটছে, বাবুসাহেব গান করছে, আর সবাই দোয়ারকি টেনে চলেছে-'রঘুপতি রাঘব রাজারাম'!... অচেতন খেপা অবস্থায় মঞ্চ কাঁপিয়ে সবাই গেয়ে চলেছে।'' অচেতন খেপা অবস্থাই হলো অন্ধকারের আড়ালে থাকা শাসকশ্রেণির আত্মরক্ষার বা স্বার্থরক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

লোকসমাজের বিচারব্যবস্থার যারা অংশীদার, যেমন পঞ্চায়েত মাতব্বর, মোড়ল, সর্দার এদের প্রতিও সমরেশ বসুর সজাগ দৃষ্টি ছিল। সমরেশের 'পঞ্চায়েত' গল্পের নিম্নবর্গীয় কুনতিকে গ্রামের মাতব্বররা বিচার করে সমাজচ্যুত করেছে। উচ্চবর্গীয়দের দ্বারা গঠিত লোকসংগঠন কুনতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। এরকম ধারা সমাজের সর্বত্রই বহমান। নিম্নবর্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর লোকসমাজ ও লোকসংগঠনের অনেক প্রভাব থাকে।

৯.

নিম্নবর্গের সংস্কৃতির প্রকাশ সাহিত্যের ভাষা প্রয়োগেও হয়। শব্দচয়ন, সংলাপে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। উচ্চবর্গের ভাষায় থাকে পরিশীলিত, মার্জিত সংহত রূপ, আর নিম্নবর্গের কথ্যবুলি ও সংলাপে পাওয়া যায় লোকসমাজের জীবনাচারের ভাষা। সমরেশ বসুর বিভিন্ন গল্পে বাস্তবসম্মত শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের ভাষার সামাজিক স্তর, শ্রেণি, বৃত্তি ও লিঙ্গের ভিন্নতাকে দেখিয়েছেন।

(ক) ''পুরুষটি চিৎকার করে বললে, *ঠেলে থাক্*। জোরে *ঠেলে থাক্*। খবরদার ইধারে আসিসনে।'' (পাড়ি)

(খ) ''আর পুরুষটি ভীষণ খিস্তি করে বলছে, চুপ চুপ কামিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষ্য হলে ডাঙায় উঠে আজ তোকে *ঠেঙিয়ে* আধমরা করতাম।'' (পাড়ি)

রাঢ়ী উপভাষার প্রয়োগ রয়েছে 'পাড়ি' গল্পে। যেমন-ইধারে, কামিনে ইত্যাদি। সমরেশ বসুর 'শানা বাউরীর কথকতা' গল্পে শানার মুখের ভাষায় বঙ্গালী উপভাষার প্রয়োগ করেছেন। বঙ্গালী ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অতীতকালের ক্রিয়ার সঙ্গে নঞর্থক অব্যয় হিসাবে 'নাই' বসে। অতিরিক্ত 'ই' কার ও 'য' ফলার ব্যবহার বঙ্গালী ভাষায় দেখা যায়।

(ক) ''দেখি নাই। এত বলি হলো, পাঁটা মোষ খাওয়া হলো, তাড়ি পচুই ভেইস্যা গেল লদীর জলের মতন, আমি দেখি নাই।''

(খ) ''আমি ভাতের ধান্দায় ফিরি, পুরুষ মানুষ কতক্ষণ ঘরে থাকবে। কিন্তু আমার মাটো আন কথা শুনায় বউকে। বলে, এত বড় জোয়ান, যোবতী বউ, তার শাউরি সুয়ামির কেনে এত দুঃখক।''

এখানে 'শুনায়', 'যোবতী' দুটি শব্দে বঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'ও' কার ও 'উ' কারের প্রবণতা বেশি প্রকটিত।

উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গে কিছু কিছু ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়— ''গামছা ঝেড়ে বলল, যাবেক কেনে নাই? শরীলটো মন্দ, মনটা ভালো নয়। চলেন, কেনে যাবেক নাই?'' ক্রিয়াপদে 'ক' এর ব্যবহার রয়েছে : যেমন- যাবেক। কর্মের সঙ্গে 'টো' শব্দাংশ যুক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় : যেমন- শরীলটো। বাংলার রাঢ় অঞ্চলের ভাষায় শব্দ ব্যবহার সমরেশ বসুর 'খিঁচাকবালা সমাচার' গল্পে যথার্থভাবে লক্ষ্য করা যায়—''আঁ এক-পইসা দিবে নাই? পেরকাশ যেন বিষম খেল, তারপরেই হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, অই আমার সনা তোর পায়ে ধরা করচি, মরে যাবক গা। বলেই খিঁচাকবালার দিকে ঝাঁপ দিল, আর আছড়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে, তোর পা ধরা করচি, উ টাকার আদা না পেল্যে মরে যাবক গা।''

সমরেশ গল্পে যুক্ত ব্যঞ্জনের পরিবর্তে স্বরবর্ণের আগমন, মহাপ্রাণ বর্ণের পরিবর্তে অল্পপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার করেছেন। যেমন-প্রকাশ > পেরকাশ, আধা > আদা ইত্যাদি।

'কিমলিস' গল্পে বেচনের মুখে হিন্দিমিশ্রিত বাংলার সার্থক প্রয়োগ হয়েছে। এছাড়া বেচনের মুখে ঠেট হিন্দির প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো। বেচন কমিউনিস্ট ঠিক কী বোঝাতে গিয়ে বলল—''টাইম যব আ যায়ে গা, ক্রান্তিওকারী সব হো যায়গা একদম্ ঠিক সে তব কামনিস্ বন যায় গা।'' 'কিমলিস' গল্পে বনোয়ারীর কথায় গোরখপুরী হিন্দির ব্যবহার সুস্পষ্ট যেমন— ''আরে তু তো বনোয়ারী কাহার কা লেড়কা নহি, কাঁহাসে সাহব বনকে আইলান অ্যা? লিখাপড়ি নহি জানত, আরে গোরক্ষপুরকা চুহা, চুতিয়া বনোয়ারী নাদন, ইসব তু বদনপর ক্যায়া চড়ায়া, অ্যাঁ কাঁহাসে চোরায়া?'' এছাড়া ঠেট হিন্দির যথার্থ প্রয়োগে সমরেশের 'পঞ্চায়েত' গল্পটিও লোকভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ শতকের দুই, তিন ও চারের দশক জুড়ে বাংলা ছোটোগল্পে সম্প্রসারিত হয়েছে বাঙালি জীবন। গল্পকাররা গ্রাম ও শহর জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়েছেন নিম্নবর্গীয়দের জীবন প্রত্যক্ষ করে। গল্পকার সমরেশ বসুর নজর বেশির ভাগ সময় শহর-গ্রামের প্রান্তিক পরিসরে। তাই প্রান্তিক পরিসরের সংস্কৃতি, স্বাধীনতার লড়াই, মহাযুদ্ধ, অর্থনীতির বিপর্যয় দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ তাঁর বেশিরভাগ গল্প জুড়ে আছে। মহাযুদ্ধ, অর্থনীতি বাঙালি জীবনের সর্বত্র পরিবর্তন এনেছে। পরিবর্তিত জীবন, শিল্প ও সংস্কৃতির চিহ্নসহ সমরেশ বসুর গল্পকথায় গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপরেখাকেও আমরা খুঁজে পাই।

''বস্তুসম্পদ জাতির সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম প্রধান উপকরণ, আর মানস সম্পদ সংস্কৃতির রুদ্ধদ্বার খুলবার চাবিকাঠি।'' সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম উপকরণের সাথে, নিম্নবর্গীয়দের যোগসূত্র খুবই গভীর। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির ভাবগত ভিত্তি বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তির উপর নির্ভর করে। তাই বিশ শতকের ছোটোগল্পকার সমরেশ বসু তাঁর গল্পে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির বস্তুগত ও ভাবগত মুক্তির প্রবাহকেই উপলব্ধি করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৭২, আগস্ট ১৯৬৫।
২। গোপাল হালদার, 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, সংস্কৃতির তিন অঙ্গ', প্রকাশ ভবন; প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮৬।
৩। ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য বিচার তত্ত্ব ও প্রয়োগ', দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৯৬, এপ্রিল ১৯৮৯।
৪। সত্যজিৎ চৌধুরী, 'সমরেশ বসু', সাহিত্য অকাদেমি; প্রথম প্রকাশ: ২০১৫।
৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'সমরেশ বসু রচনাবলী ১০', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৫।